রবীন্দ্রনাথের 'নারী' প্রবন্ধে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজকল্যাণ ভাবনা

রাকেশ জানা

পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে নারীকে। শুধু সৃষ্টি করেই বা জন্ম দিয়েই নারীর দায়িত্ব শেষ হয় না, সেই প্রাণকে সে লালন ও পোষণ করে বড় করে তোলে। প্রকৃতিই জীবনপালনের সমস্ত বৃত্তিজাল প্রবল করে জুড়ে দিয়েছে নারীর দেহ-মনের তন্তুতে তন্তুতে। "এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয় বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্য—প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্য্যে।"[১] তাই নারী মানব সংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার আদিম বাঁধুনি দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মূল ভিত্তি নির্মাণ করেছে। "সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলন-কেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজ বন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।"[২]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ রচনার বহু পূর্বে 'গোরা' উপন্যাসে গোরার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমাজ শৃঙ্খলারক্ষা বা সমাজবন্ধনের প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছিলেন। "দিন আর রাত্রি সময়ের এই দুটো ভাগ—পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় ও নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে তার যে গভীর কর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না। সে গোপনে বিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতিপূরণ করে আমাদের পোষণের সহায়তা করে। যেখানে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে—সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে সমস্ত রাত নাচ-গান হয়—তাতে ফল কী হয়? ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনই আমরা প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে টেনে আনি তা হলে তাদের নিগূঢ় কর্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়—তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও

শান্তি ভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ শক্তি বলে ভ্রম হয়, কিন্তু সে শক্তি বিনাশ করবারই শক্তি। শক্তির দুটো অংশ আছে—এক অংশ ব্যক্ত। আর এক অংশ অব্যক্ত, এক অংশ উদ্‌যোগ আর এক অংশ বিশ্রাম, এক অংশ প্রয়োগ আর এক অংশ সংবরণ। শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট করো তাহলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়। নরনারী সমাজ শক্তির দুই দিক পুরুষ ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়—নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলই ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুত বেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।"[৩] গোরার এই বক্তব্যে সমাজ শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায়ের বার্তা রয়েছে; রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নে থেকে সমাজবিষয়ক এই ভাবনাটি গোরার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

প্রকৃতি নারীর স্বভাবের মধ্যে প্রেম ও স্নেহ দিয়ে তাকে প্রেয়সিত জননীরূপে চিরন্তন করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষ কর্মের পরীক্ষায় প্রতিনিয়তই নিজের দেহ পরিবর্তন করে এসেছে। অভিজ্ঞতার জোরে ত্রুটি সংশোধন করে সে নিজেদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। 'পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙাগড়া চলছে'—কিন্তু এযাবৎ নারীর স্বভাবের কোনও বদল হয়নি। তাই 'নারী পুরাতনী'। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয় সম্পদ দিয়েছেন তাতে সে গৃহিণীরূপে ও জননীরূপে এ যাবৎ আপন কাজ সুচারুভাবে করে আসছে, এই কাজ তাদের স্বভাবসংগত। প্রকৃতির কাছ থেকে এই অশিক্ষিত পটুত্ব ও মাধুর্যের ঐশ্বর্য তারা সহজেই লাভ করে। এই রসধারায় সংসার শস্যশালী হয়ে ওঠে, সংসারে সাফল্য আসে। কিন্তু যে সব নারীর স্বভাবে এই রস নেই সে সংসারে কখনই সুখ তথা শান্তি লাভ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে যে সম্পদ অনায়াসে পাওয়া যায় তাতে বিপদ আছে; কারণ তা অন্যের পক্ষে লোভনীয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে সহজ সম্পদশালী দেশকে বলবানরা কব্জা করতে চায়। তাই অনুর্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকাটা যতটা সুবিধার, উর্বর দেশের পক্ষে ততটা নয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে পাখি দেখতে সুন্দর ও সুকণ্ঠের অধিকারী হয় তাকে মানুষ কিভাবে খাঁচায় বন্দী করে গর্ব অনুভব করে। এই অবস্থার শিকার মেয়েরাও। এই কারণেই "মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবা নৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে।"[৪] আসলে মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেই কারণেই এটা এত সহজ হয়েছে। তাঁর মতে নারীর এই বুদ্ধি, সংস্কার ও আচরণ বহু যুগ ধরে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন। "তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাইরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়নি। এই জন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে

অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে।"[৫] নারীর এই অবরুদ্ধ অবস্থা ক্ষতিকর। এই অজ্ঞানতা মেয়েদের বিচারবুদ্ধিকে আবিল করে রাখে, ফলে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ'—ও এদেশে কম নেই; তাঁরা শিশুকাল থেকে এই বিচারবুদ্ধিহীন মেয়েদেরই হাতে গড়া। ফলে দেখা গেছে তারাই মেয়েদের প্রতি বেশি অত্যাচারী হয়। তাই তাঁর মতে মেয়েদের গৃহপ্রাচীরে আবদ্ধ করে রাখলে সমাজ বাড়তে পারে না। মেয়েরা শিক্ষিত হলেই বংশধরেরাও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হয়ে আদর্শসমাজ গড়ে তুলবে এই তাঁর আশা।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ 'সীমানা ভাঙার যুগ' এসে গেছে। মেয়েরা সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে চারিদিকে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ইউরোপে তো বটেই আধুনিক এশিয়াতেও তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারী জগারণেরই দৃপ্ত ঘোষণা রয়েছে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে নারীদের যেভাবে দেখেছেন বর্তমানে সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে ছিল পাল্কির যুগ। বেশিরভাগ সম্ভ্রান্ত বাড়ির মহিলাদের পাল্কিতে ঘেরাটোপ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি বেথুন স্কুলে যে পাল্কিতে চড়ে পড়তে যেতেন, সেটা অবশ্য দ্বারখোলা পাল্কি ছিল। তাহলেও সে সময় তাঁর এই ব্যবহার সম্ভ্রান্ত বংশের আদর্শকে কষ্ট দেয়নি। তবে সে সময় এক বস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল এছাড়াও শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে মেয়েদের রেলগাড়িতে চড়াও সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের ক্ষেত্রে তখনকার দিনে সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে সমাজে মাথাব্যাথা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তবে বর্তমানে ঢাকা পাল্কির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। এ পরিবর্তন আপনা-আপনিই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে সকল দেশে আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না—তারা পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতঃই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচারবিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।"[৭] মেয়েদের বিয়ের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়েছে। আজ বাল্যবিবাহ আইন বিরুদ্ধ। তাদের জীবনে জ্ঞানের

আলোক প্রবেশে তাদের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতঃই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠেছে মহানদী হয়ে।"[৯]

আজ আমরা আর মেয়েদের বলতে পারি না 'পথে নারী বিবর্জিতা' বলে। এই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়, অন্তরেরও পরিবর্তন। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে—'মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না।' মেয়েরা আজ মুক্ত মন নিয়ে চিন্তাও বিচার করবার অধিকারিণী হয়েছে। সে পুরোনো সংস্কার ও আচার ব্যবহারকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে শুরু করেছে। এই যাচাই-এ নানা ভুলচুক হতে পারে, তবে একদিন সে এই ভুল থেকে উত্তীর্ণ হবে। বিচারহীন পুরোনো অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে আধুনিককালের সাপেক্ষে তার মন সংকীর্ণ হয়ে উঠবে তাতে পদে পদে অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পাবে। আর তাছাড়া আধুনিককালের স্রোতকেও তো ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। এতদিন মেয়েরা গৃহস্থালির ছোট আবেষ্টনীর মধ্যে যখন আবদ্ধ ছিল তখন তাদের জীবনে নানান কর্মগুলি 'মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি' দিয়েই সমাধান করতো। এ জন্য তাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তাই স্ত্রীশিক্ষার কথা তখনও কেউ ভাবতে চাইতো না। তাছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজশাসকেরা এটা জানতেন যে অজ্ঞানের অন্ধসংস্কারে মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখলে, তাদের স্বাধিকার হরণ করলে; তাঁরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। এতে পুরুষদের অহংও বজায় থাকবে। রবীন্দ্রনাথের মতে আজ এই অবস্থার পরিবর্তন হলেও আমাদের দেশে এরিকম অহংকারী পুরুষও কম নেই; তাঁর আজও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মম বর্বরতাকে আঁকড়ে আছেন।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র শুধু গার্হস্থ্য জীবনেই আটকে নেই তা সুদূর প্রসারিত হয়েই চলেছে। তারা বিদ্যাচর্চার দ্বারা নিজের আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মান অর্জন করেছে। আজকের দিনে নিরক্ষরতার লজ্জা ভদ্র মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো লজ্জা। আগেকার দিনে ভদ্র মেয়েদের পক্ষে জুতো ও ছাতা ব্যবহার লজ্জাকর ছিল, আজ আর তা নেই। তবে বর্তমানে বাটনা-বাটা ও কোটনা-কোটায় মেয়েদের অক্ষমতার লজ্জা কিছুই নয়, নিরক্ষরতার লজ্জার কাছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গার্হস্থ্য বাজার-দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো-আনা খাটছে না। যে বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।"[১০] এই পদ্ধতিতে আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

আজ তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে শিক্ষার আলোকরশ্মি, তারা পেয়েছে মুক্ত আকাশের সন্ধান। এতদিন ধরে যে সব জড় সংস্কারের বেড়াজাল তাদের আচ্ছন্ন করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে না কেটে গেলেও তার মধ্যে ছেদ হয়েছে। এখন মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। এসেছে নতুন যুগ।

এতকাল ধরে মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। "এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ।"[১১] মেয়েরা সেখানে ছিল ব্রাত্য, তারা পেছন থেকে শুধুই প্রকাশহীনভাবে গৃহকর্ম করেছিল। তাই সভ্যতা ক্রমশই হয়ে উঠেছিল এক-ঝোঁকা, রুক্ষ্ম-পুরুষকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের তাই মনে হয়েছে—"এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়েছিল।"[১১] সেই কৃপণের ভাণ্ডার হল মমত্ব, হৃদয় মাধুর্য, সেবা ও কল্যাণের ধর্ম। আজ মানবসভ্যতা নির্মাণে মেয়েদের ও একটা বড় ভূমিকা তৈরি হচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।"[১২] পুরুষ নির্মিত সভ্যতা এতদিন ক্ষমতার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে তাতে মায়া-মমতার স্থান ছিল অল্প। তাই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সভ্যতায় ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত।"[১৩] লেখক তাই নতুন সভ্যতার আশাকলা নির্মাণ করেছেন—যেখানে মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি নিয়ে—"কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।"[১৪] তিনি এমন সভ্যতা নির্মাণের কল্পনা করেছেন যেখানে ব্যক্তিহননকারীদের স্থান নেই, স্থান নেই নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীল ব্যবস্থার। তিনি আশাবাদী মেয়েরা এই নতুন সভ্যতা নির্মাণে পূর্ণ সহায়তা করবে। সেই নতুন সভ্যতার যুগ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আনবে। তবে তার পূর্বে—"সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বোতভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফল লাভের কথা পরে আসবে—এমন-কি, না আসতেও পারে—কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের 'নারী' প্রবন্ধ থেকে কিছু গূঢ় মতামত বেরিয়ে আসে যা বেশিরভাগই নারী শিক্ষা স্বপক্ষে ও সমাজ শান্তি প্রতিষ্ঠার ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ চিরন্তনী নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা গুণগুলিকে সামনে নিয়ে এসে কিভাবে কল্পিত আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যায় তার একপ্রকার মডেল তৈরি করেছেন। নারীশিক্ষার

স্বপক্ষে যেমন তিনি অহংকারী, নারী শিক্ষা বিদ্বেষী, রক্ষণশীল পুরুষদের নিন্দা করেছেন ঠিক তেমনি আবার নারীকে সর্বাগ্রে যোগ্য হয়ে ওঠার কথাও বলেছেন। সঠিক শিক্ষার দ্বারা নারী যোগ্যতা লাভ করলেই সবার কাছ থেকে সম্মান পাবে। তিনি মনে করতেন স্ত্রী শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষা শিল্প বা সাহিত্যচর্চা নয়। নারীর কর্তব্য, নারীর আচরণীয় কার্যাবলী শিক্ষালাভই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। আসলে তাঁর কাছে শিক্ষার পরিচয় হল ভদ্র ব্যবহারে, শিক্ষার সার্থকতা হল চরিত্র সাধনে আর শিক্ষার পরিপূর্ণতা হল আদর্শজীবনে। অর্থাৎ শিক্ষিত নারীর চাকুরি প্রাপ্তি দিয়েই তার মর্যাদা অর্জন বা যোগ্যতা লাভ হয় না। 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনায়' রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যকে অনেকটা পরিষ্কার করেছেন—

"প্রকৃতিই রমনীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে—অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনাপাওনা কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যবসা, বিজনেস্। এ জন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশস্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষালাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ প্রবাসকালে ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের ভয়ঙ্কর স্বরূপ দেখতে পান। ইটালিতে ফ্যাসিজম ও জার্মানিতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানে হিটলারের আগ্রাসী উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবে তিনি শঙ্কিত ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। আবার অন্যদিকে ব্রিটিশদের ভদ্র মুখোশের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিয়ে আফ্রিকাকে আক্রমণ তাঁকে পীড়া দেয়। তিনি আভাষ পেয়েছিলেন বিশ্বের তথাকথিত সভ্য দেশগুলি কিভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। 'কালান্তর' গ্রন্থে এর পরিচয় রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে শান্তির আবহাওয়া আনতে তথা শুভ চেতনা আনতে প্রয়োজন মমত্ব, হৃদয়মাধুর্য্য, জীবসেবা ও কল্যাণের আদর্শ। যা নারীদের স্বভাবধর্ম। ক্ষমতা ধ্বংস করে আর মমতা বেঁধে রাখে। তাই নারীর এই প্রকৃতিদত্ত কল্যাণময়ী স্বভাব তথা সম্পদকে বিশ্ববাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করে তিনি বিশ্বসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ আনতে প্রত্যয়ী।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালান্তর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, 'নারী',

বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ-৩৬১।

২. তদেব। পৃ-৩৬১।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গোরা। বিশ্বভারতী। রবীন্দ্র রচনাবলী। সুলভ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৪৪২।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালান্তর। 'নারী'। পৃ-৩৬৩, ৩৬৪।

৫. তদেব। পৃ-৩৬৪।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহুয়া। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৩৬, পৃ-৬৪।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালান্তর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। কলকাতা, 'নারী'। বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ-৩৬৪, ৩৬৫।

৮. তদেব। পৃ-৩৬৫।

৯. তদেব। পৃ-৩৬৭।

১০. তদেব। পৃ-৩৬৭।

১১. তদেব। পৃ-৩৬৮।

১২. তদেব। পৃ-৩৬৮

১৩. তদেব। পৃ-৩৬৯।

১৪. তদেব। পৃ-৩৬৯।

১৫. তদেব। পৃ-৩৭০।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা। সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন, ১২৯৮।